সংবাদ প্রতিদিন
ছুটি
রবিবার ২৩ জুন ২০২৪

জন্ম জলপাইগুড়ির মধ্যবিত্ত পরিবারে। সাড়ে সতেরো বছর বয়সে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যান ছত্তিশগড়, তারপর আর ফিরে আসেননি বাংলায়। সাধারণ শ্রমিকের মতোই যুক্ত ছিলেন উৎপাদনের কাজে, রাস্তা তৈরি বা পাথর ভাঙার দলে, খাল-পুকুর কাটার ভিড়ে। শ্রমিক শ্রেণির সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ফিরে দেখা বিস্মৃত শংকর গুহনিয়োগী-কে।

শ্রমিকের মসিহা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ashoke10@gmail.com

তাঁর কথা বলতে গেলে অনেক 'তাহাদের কথা' পেরিয়ে আসতে হবে।

১৮৫৩-'৫৪ সালে কলকাতা থেকে রানিগঞ্জ অবধি রেললাইন পাতা হয়ে গেলে সেই সূত্র ধরে শুরু হয় কয়লা, চট, কাপড়, লোহা ইত্যাদির ছোট-বড় নানা ধরনের কলকারখানা। ঝরিয়াতে বড় বড় কয়লাখনি কাজ চালু করে দিলে শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। চটকল, কাপড়কলেও দ্রুত বাড়তে থাকে শ্রমিক সংখ্যা। এর সঙ্গে বিপুল সংখ্যক রেল-শ্রমিক তো আছেই। তাদের কাজকর্মের প্রভাব তো পড়বে সমাজে; তাদের পক্ষ নিয়ে, তাদের কথা বলবে কেউ না কেউ।

এমনই একজন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬), যিনি তাঁর সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় জানালেন ১৮৬২ সালের রেল শ্রমিক ধর্মঘটের খবর। 'সম্প্রতি হাবড়ার রেইলওয়ে ষ্টেসনে প্রায় ১২০০ মজুর কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমোটিব (গাড়ি) ডিপার্টমেণ্টের মজুরেরা প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু তাহাদিগকে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানি মজুরদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন, নচেৎ লোক পাইবেন না।' বোঝাই যাচ্ছে, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তথা সোমপ্রকাশ কাগজের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে রেলওয়ে ধর্মঘট ও মজুরদের প্রতি।

১৮৬২ সালে যখন কলকাতার কাগজে রেল-শ্রমিক ধর্মঘটের খবর প্রকাশিত হচ্ছে, তত দিনে, ভারতের পশ্চিমে, বম্বে শহর থেকে থানে অবধি রেললাইন পাতা হয়ে গিয়েছে, পারসিদের পরিচালনায় ওই শহরে গড়ে উঠেছে একের-পর-এক কাপড়কল, সুতোকল। এর বছর তিরিশেক পর ১৮৯০ সালে নারায়ণ মেঘাজি লোখান্ডে (১৮৪৮-১৮৯৭) গড়ে তুলবেন 'বোম্বে মিল হ্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন', যা এই দেশে সংগঠিতভাবে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা করে মোট চারটি বড় সুবিধা আদায় করে নেবে, যথাক্রমে—

১) সপ্তাহে একদিন (রবিবার) ছুটি।

২) দুপুর-বিকেলে আধ ঘণ্টার বিরতি।

৩) প্রত্যেক দিন সকাল সাড়ে ছ'টায় কারখানার কাজ শুরু যা শেষ হবে সূর্য ডুবে গেলে।

৪) আর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বেতন দিতে হবে অবশ্যই।

কিন্তু এসব যখন ভবিষ্যতের গর্ভে, শ্রমিকদের সূত্রে দ্বিতীয় যে-বাঙালির কথা মনে পড়ে, তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট সদস্য শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫)। শ্রমিকদের শিক্ষণ-কেন্দ্র হিসাবে শশীপদ গড়ে তোলেন 'শ্রমজীবী সমিতি' (১৮৭০)। সমিতির উদ্যোগে 'ভারত শ্রমজীবী' নামে এক পয়সা দামের এক সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশ পায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগ্নে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'শ্রমজীবী' কবিতা, 'উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই!/ উপস্থিত যুগান্তর/ চলচল নারীনর/ ঘুমাবার আর বেলা নাই,/ উঠ জাগো ডাকিতেছি তাই।...'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন'-এর জন্ম— এসবের প্রভাব পড়ে ভারতের মজুরদের উপর। একই সঙ্গে যেমন চালু হয় শ্রম-আইন, তেমনই শুরু হয় ধর্মঘট। ১৯২০ থেকে পরবর্তী চার বছরে ধর্মঘটের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। দেশের প্রথম নথিভুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন বোমানজি পেস্টনজি ওয়াদিয়া (১৮৮১-১৯৫৮) স্থাপিত "ম্যাড্রাস টেক্সটাইল ওয়ার্কারস' ইউনিয়ন", ১৯১৮ সালে। এরপর ১৯২০ সালে স্থাপিত হয় 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'।

১৯২১ সাল থেকে, প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের কেউ-কেউ দেশে ফিরতে থাকেন। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ফিরে আসেন ১৯২৫ সালের প্রথমার্ধে। দেশে ফিরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ না দিলেও, দল প্রভাবিত, পরিচালিত 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এ যোগ দেন। ১৯২৭ সালে, খড়গপুরে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিকরা পরপর দু'-বার দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট করে। ওই বছরের ৭ সেপ্টেম্বর রেল কর্তৃপক্ষ খড়গপুর ওয়ার্কশপের ১৭০০ শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের নোটিস দিলে পরদিন থেকে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে। পাঁচদিন পর, কর্তৃপক্ষ লকআউট ঘোষণা করলে, বামপন্থীরা খড়গপুরে ছুটে যায়, যার মধ্যে ছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ভূপেন্দ্রনাথের প্রধান কাজ ছিল দেশের সদ্যোজাত বামপন্থী শ্রমিকদের মার্কসবাদে শিক্ষিত করে তোলা।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর প্রগাঢ় অনুরাগী বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাবে ১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল কলকাতার রাস্তায়, যেদিন, দাবি-প্রতিবাদ ধ্বনিত করতে মোষের গাড়ির গাড়োয়ানরা তাদের গাড়ি থেকে মোষ খুলে, পরপর গাড়িগুলি সাজিয়ে শিয়ালদা থেকে হাওড়া অবধি গোটা হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড) অবরোধ করে। পুলিশের গুলিতে সেদিন পাঁচজন গাড়োয়ান নিহত হয়।

সে-সময় ট্রাম মজুরদের সংগঠনটিও বেশ শক্তিশালী। মহম্মদ ইসমাইল ট্রাম শ্রমিকদের নেতা। অশোক মিত্র লিখছেন, 'মহম্মদ ইসমাইলের চুলগুলি এখন সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে, উনিশশো চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সালে কিন্তু অনেক কালোর ঝিলিক ছিল, তাঁকে এসপ্লানেডের গুমটি থেকে পার্ক সার্কাসের ঘাঁটি পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ঘুরতে দেখা যেত, লড়াকু ট্রামকর্মীদের জোট আরও যাতে দৃঢ় করা যায়। এক সকালের কথা মনে পড়ছে, মে মাস, হাওয়ায় প্রথম গ্রীষ্মের ঝলক, আগের দিন জার্মানির পতন

মতবিরোধ হল পার্টির। তাঁর মতে, ট্রেড ইউনিয়নকে ত্যাজ্যপুত্র করা ঠিক নয়, তাকে নিজের নীতি অনুযায়ী গড়েপিটে নাও, কিন্তু ত্যাগ কোরো না। কথাবার্তা চালাচালির পরিণতিতে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে।

তাঁর দেখার ভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র; ট্রেড ইউনিয়ন বলতে লোকে বুঝত আট ঘণ্টার শিফ্‌টে উৎপাদনের কাজ করা শ্রমিকদের আর্থিক দাবি আদায়ের সংগঠনকে, যারা বেতন-বোনাস, ছুটি-কারখানার অব্যবস্থা— এসব নিয়ে আন্দোলন করে। কিন্তু উনি বললেন, আট ঘণ্টা কাজের বাইরে শ্রমিকের বিশ্রাম ছাড়াও খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা নিয়েও কম-বেশি ভাবতে হয়। মন্দ বলেননি তো মানুষটি— শ্রমজীবীরা ভাবল। অতএব, সংগঠনের কর্মসূচিতে আর্থিক দাবিদাওয়ার সঙ্গে জুড়ে গেল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, ইতিহাস আরও কত কী!

একবার শ্রমিকরা জানকবুল লড়াই করে দৈনিক মজুরি দু'-আড়াই টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৬ টাকারও বেশি করে নিতে পারল। লড়াইয়ে তাদের ১১ জন সহকর্মী পুলিশের বুলেটে প্রাণ দেয়। আবার দেখা গেল, হাতে হঠাৎ বেশি টাকা আসায় শ্রমিকদের মদ খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে গেল। তবে কি লড়তে গিয়ে ওই যারা শহিদ হল তাদের রক্ত মদের ভাঁটির বর্জ্য-প্রণালী দিয়ে বয়ে যাবে? নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি। নিজেই উত্তর দিলেন, না, এ হতে দেওয়া যাবে না। তাহলে? বোঝানো শুরু হল শ্রমিকদের। কীভাবে, কোন কৌশলে তাদের মদের খরচ চলে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের হাতে। কেমন করে নেশা তাদের আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। কেমনভাবে শরীর-স্বাস্থ্য, পরিবার তথা তাদের নিকটের সমাজের ক্ষতি করবে এই মানুষখেকো নেশা। সবই ধৈর্য ধরে বোঝালেন তিনি। সময় লেগেছিল বছর তিনেক, মদচক্রের গুন্ডাদের মোকাবিলাও করতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ জয় হল তাঁরই। তাঁর নেতৃত্বে মদ খাওয়া ছেড়ে দিল প্রায় এক লক্ষ মানুষ। আগে যেখানে শতকরা ৯৫ জন শ্রমিক মদ খেত, কমে হল শতকরা পাঁচ। যারা নেশা ছাড়ল, অধিকাংশই আদিবাসী, যেখানে তাদের সমাজে বাচ্চাবুড়ো সবাই মদ খায়।

মদ খাওয়া তো বন্ধ, তাহলে কী অবসরের সময় কাটবে নোংরা যৌন-বায়োস্কোপ দেখে? এ প্রশ্নও তো ঘুরেছিল তাঁর মাথায়। তিনি ওদের কারও কারও পাথরভাঙা-হাতে কলম ধরিয়ে দিলেন; লেখা শুরু হল গান, কবিতা, এমনকী নাটকও। জেগে উঠল গায়ক-নাট্যকর্মীদের মুখ। তাদের নিয়ে গড়ে উঠল, 'নয়া আঞ্জোর লোক-সাংস্কৃতিক মঞ্চ'। 'নয়া আঞ্জোর' ছত্তিশগড়ের উচ্চারণ, যার মানে 'নতুন সূর্যের কিরণ'। এই বালার্কের ব্যঞ্জনায় জেগে ওঠা নতুন মানুষেরা সৃষ্টি করতে শুরু করল লোকগীতি, কবিতা এবং নাট্য যার সুর চেনাজানা কিন্তু মর্মবস্তু সম্পূর্ণ নতুন।

শ্রমজীবীদের প্রায় প্রত্যেকে নিরক্ষর। তাদের সন্তানদের জন্যও কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। কারখানার কর্তৃপক্ষের গড়া স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ পেত নির্বাচিত কিছু কর্মীর ছেলেমেয়েরা। তিনি ভাবলেন, এ অন্যায়। ইউনিয়নের কর্মসূচিতে ঢুকে গেল প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার উদ্যোগ। এলাকায় গড়ে উঠল ছ'টি প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল আর প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। পড়ার আগ্রহ বাড়াতে ইউনিয়ন দফতরগুলিতে স্থাপন করা হল পাঠাগার। কেনা হল প্রোজেক্টর। দেখানো হতে থাকল উন্নতমানের সিনেমা। এর পাশাপাশি, ইউনিয়নের আন্দোলনের চাপে পড়ে রাজ্যের সরকার আর কারখানা কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকটি উচ্চ মাধ্যমিক-মাধ্যমিক-প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করতে বাধ্য হল।

বস্তিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার কারণ যথেষ্ট; জঞ্জালের গন্ধে টেকা দায়, নেই কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা। তাঁর উদ্যোগে ১৯৮১-তে শুরু হল 'স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রাম'। প্রথমদিকে জঞ্জাল পরিষ্কারের আন্দোলন। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হল শ্রমিক বস্তি থেকে নিয়মিত ময়লা সাফাইয়ের বন্দোবস্ত করতে। এক ধাক্কায় পরিবেশের কটু গন্ধ উধাও! আন্দোলনের ঠ্যালায় বস্তিতে-বস্তিতে একাধিক নলকূপ বসে গেল। পানীয় জলের জন্য আর দূরে কোথাও যেতে হয় না। আরও দু'-কদম এগিয়ে, ইউনিয়ন তাদের ১১ জন শহিদ সহযোদ্ধার কথা মনে রেখে গড়ে তুলল শহিদ হাসপাতাল। ১৯৮৩ সালের ৩ জুন দ্বারোদ্ঘাটন হল শহিদ হাসপাতালের। তখন মাত্র ১৫টি বেড। এক দশকের মধ্যে ওই হাসপাতালে এসে গেল চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সব আধুনিক সরঞ্জাম, বেডের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭০। এলাকার গরিব শ্রমিকদের আশা-ভরসার কেন্দ্র হয়ে উঠল ওই শহিদ হাসপাতাল। কারণ, তারা বুঝে গিয়েছিল ওইখানে গেলে যেমন পাওয়া যাবে সুলভে বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা, তেমনই পাওয়া যাবে স্বাস্থ্য বজায় রাখার বুদ্ধিও।

স্বাস্থ্যের পাশাপাশি, তাঁর উদ্যোগে কর্মসূচিতে ঢুকে পড়ল পরিবেশ রক্ষার কথাও। মানুষ যদি জানে কোনটা কী গাছ, যদি বোঝে, কোন গাছ তার কী কাজে লাগে, তাহলে সে গাছ কাটবে না, অন্যকেও কাটতে দেবে না। গাছ চেনানোর, তার গুণ বোঝানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ইউনিয়ন দফতরের পিছনের জমিতে গড়ে তোলা হল আদিবাসীদের জন্য উপকারী লতাগাছ এবং বৃক্ষের একটি ছোটখাট অরণ্য।

শ্রমিকরা জানকবুল লড়াই করে দৈনিক মজুরি দু'-আড়াই টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৬ টাকারও বেশি করে নিতে পারল। লড়াইয়ে তাদের ১১ জন সহকর্মী পুলিশের বুলেটে প্রাণ দেয়। আবার দেখা গেল, হাতে হঠাৎ বেশি টাকা আসায় শ্রমিকদের মদ খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে গেল। তবে কি লড়তে গিয়ে ওই যারা শহিদ হল তাদের রক্ত মদের ভাঁটির বর্জ্য-প্রণালী দিয়ে বয়ে যাবে?

নারী তুমি অর্ধেক আকাশ— এমন মহৎ স্লোগানের জনক নন তিনি। বস্তুত, স্লোগান দিতেই হয়নি তাঁকে, কারণ তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন নারী-পুরুষ সমান। জলপাইগুড়ির মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানটি আইএসসি পাস করে সাড়ে সতেরো বছর বয়সে সেই যে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে এসেছিলেন ছত্তিশগড়, তারপরে আর ফিরে যাননি। সাধারণ শ্রমিকের মতোই তিনি ছিলেন উৎপাদনের কাজে, কখনও ইস্পাত কারখানার কোক-আভেন বিভাগে, কখনও রাস্তা তৈরি বা পাথর ভাঙার দলে, আবার কখনও খাল-পুকুর কাটার ভিড়ে।

বিবাহ করেছিলেন এক আদিবাসী শ্রমিক কন্যা আশোবাঈ ওরফে আশা-কে। থাকতেন ভাঙা কুঁড়ে ঘরে। দুই ছেলে আর এক মেয়েকে নিয়ে আর পাঁচজন শ্রমিকের মতোই। এই যার জীবনযাপন, তাঁকে আবার ঘটা করে 'অর্ধেক আকাশ'-এর মতো ব্যঞ্জনা ছড়াতে হবে কেন? তিনি সোজাকথার মানুষ; গড়ে তুললেন 'মহিলা মুক্তি মোর্চা'। মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন শুরু হল যখন, তাকে জয়ের রাজ্যে পৌঁছে দিল তো এই মহিলা মুক্তি মোর্চাই। আন্দোলনকারীদের সামনে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থাকলে, তারা লড়তে উৎসাহ পায়। অতএব তাঁর নেতৃত্বে গবেষকের দল খুঁজে বের করল এক বীরকে।

বীর নারায়ণ সিংহ, ছত্তিশগড়ের প্রথম শহিদ। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহে তিনি ছত্তিশগড়ের আদিবাসী কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দীর্ঘ লড়াইয়ের অন্তিমে ব্রিটিশ সেনা তাঁকে গ্রেফতার করে, মৃত্যুদণ্ড দেয়। বিস্মৃতির গভীর থেকে বীর নারায়ণ সিংহকে উদ্ধার করে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর সঙ্গীরা।

ধীরেশের বাস্তববুদ্ধি ছিল প্রখর। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত, শহিদ হাসপাতালের প্রাক্তন ডাক্তার পুণ্যব্রত গুণের কথায়, তাঁর কাছে

ঘটেছে, বার্লিন সোভিয়েট সেনাদলের কুক্ষিগত, হিটলার বিষপানে আত্মহত্যা করেছে, সকালের রোদ্দুরে রুপুলি ট্রামগুলি উদ্ভাসিত, লাল ঝাণ্ডায়-ঝাণ্ডায় প্রতি ট্রামের অবয়ব একাকার, এমনি-একটি ট্রামে ড্রাইভারের পাশে দাঁড়িয়ে পরিচ্ছন্ন হিন্দুস্থানী জবানে ইসমাইল বক্তৃতা দিচ্ছেন, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, কমরেড স্টালিন জিন্দাবাদ... ।'

১৯৬৯ সালে যখন এক নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠল, সেই দলের কর্ণধাররা ট্রেড ইউনিয়নের মতো খোলামেলা অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের চিরাচরিত সংগঠন গড়ার পথ নিলেন না। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রবিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে ওসব অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনের অর্থ বড় লড়াইয়ের পা টেনে ধরা। যা আদতে সংশোধনবাদ। এই নিয়ে অসিত সেন, পরিমল দাশগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে মতবিরোধ হল চারু মজুমদার-পন্থীদের।

যাঁর কথা এক্ষেত্রে বলতেই হবে, সেই ধীরেশের সঙ্গেও

জন-আন্দোলন 'এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মতো যাকে অনেক সংগ্রাম, সন্ধি, বিরতি আর চড়াই-উৎরাই এর মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়।' কোনও কিংবদন্তি গায়ক অনুষ্ঠানের পূর্বাহ্নে যেমন যাবতীয় মামুলি কাজের কথার মধ্যেও অনুশীলিত সুর ধরে রাখার চেষ্টা করেন, কোনও অভিনেতা যেমন মঞ্চে পদার্পণ করার বা ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি বাক্যে চাবিয়ে দিতে থাকেন তার আগামী অভিনয়ের মেজাজ, তাঁরও তেমন, প্রতিটি সম্পর্ককে শ্রমিকদের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা; শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে, কখনও মিত্রপক্ষে টেনে এনেছেন কেন্দ্রের কোনও নেতাকে, কখনও রাজ্য সরকারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ অধিকর্তা তাঁকে সরবরাহ করেছে গোপন তথ্য। নিরন্তর লড়াইয়ের অভিভাব থাকলেই বোধহয় এমনই সিদ্ধি হয়।

যে-রাজ্যে কাজ করেছেন, তার বাইরে দেশের অধিকাংশ খেটে-খাওয়া-মানুষ তাঁকে চিনত না। ১৯৯১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার পর, তাঁর নাম সবাই জেনে গেল, 'ধীরেশ' ওরফে 'শংকর গুহনিয়োগী'।